রবীন্দ্রনাথ ঃ যাপন-উদ্‌যাপন

রুশতী সেন,
সহযোগী অধ্যাপক,
অর্থনীতি বিভাগ,
বাসন্তী দেবী কলেজ

উদ্‌যাপনের অঙ্গীকার

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট গল্প লিখেছিলেন। ফরাসি দেশে প্যারিস শহর থেকে সামান্য দূরে পিয়ের শোপ্যাঁ থাকেন কন্যা ক্যামিলকে নিয়ে। বাপ-মেয়ের ঐকান্তিক ভালোবাসা তাদের বাগান; যেখানে গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, স্বাদ বদল করে বানিয়ে তোলেন নিত্যনতুন স্বভাবের ফুলফল। লাল ফুলকে নীল করেন, যে-ফল ফলতে ছ-মাস লাগে, তাকে ফলান দু-মাসে। এ-কাজে ধৈর্যও লাগে, আনন্দও মেলে। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধিতে মাটো পিয়ের, ফুল-ফলের বিনিময়মূল্য নিতেও ভুলে যান কখনো-কখনো। তাই দারিদ্র্য তাদের ঘোচে না। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে ফ্রান্সের, রাষ্ট্রের বিধান বড় কড়া, যুদ্ধে যেতেই হবে পিয়েরকে। মেয়ে কথা দিল, প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে তাদের বাগানকে। তার স্বপ্ন তখন হলুদ রজনীগন্ধা ফোটানো। যুদ্ধ থেকে বাবা ফিরলে সেই অভূতপূর্ব ফুল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। যেদিন খবর এল, যুদ্ধক্ষেত্রে পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তকমা, সেদিন খবরটা পাওয়ার জন্য বেঁচে রইল না ক্যামিল, তাদের বাগানও ছারখার। *গল্পস্বল্প* সংকলনের অন্য গল্পগুলোর মতো এ-কাহিনীও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এক বালিকাকে উদ্দেশ করে—'দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি'[১], এই ছিল 'ধ্বংস' নামের গল্পটির সূচনা, যে-গল্পে *গল্পস্বল্প*-র আর পাঁচটা গল্পের মতো রূপকথার আদল নেই, নেই সাবেককালের কোনো ঘটনা বা চরিত্র নিয়ে কোনো উপশমের প্রলেপ। ক্যামিল আর তার প্রাণের বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে গল্পে লেখা হয়, '...সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে— সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসেব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি'।[২] গল্পের শেষে আছে সেই কবিতা ঃ

কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।[৩]

কবিতার শেষে বিধাতাকে বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে/মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।[৪]

জীবনের উপান্তে 'সিভিলাইজেশন' কথাটা কেমন তিক্ত, বিশ্রী, অশালীন হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে!

পশ্চিমের যুক্তি-প্রগতি-আধুনিকতায় তাঁর এতকালের বিশ্বাস যে যাবার বেলায় একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল, এমনই বলেছিলেন আটদশকের প্রাচীন মানুষটি জীবনকালের শেষ জন্মদিনে। 'সভ্যতার সংকট'[৫] নামে যে ভাষণের পরিচিতি। আকৈশোর আমৃত্যু প্রবন্ধ-নিবন্ধের যে বিপুল সম্ভার তাঁর, যা রবীন্দ্ররচনার সর্বাপেক্ষা স্বল্পপঠিত অংশ, সে-সম্ভারের মনোযোগী পাঠে দেখা যায়, জীবনভর নিজেকে ভাঙায়, গড়ায়, আবার ভাঙায়, আবার গড়ায় নামমাত্র আলস্য কিংবা অহং তাঁর ছিল না। তাই মধ্যবয়সে যিনি নাবালক পাঠকদের উদ্দেশ্যে *শিশু, শিশু ভোলানাথ* লিখেছিলেন, তিনিই, *রক্তকরবী, মুক্তধারা*-র সেই স্রষ্টাই শেষবয়সে *গল্পস্বল্প*-র পাঠককে পৌঁছে দিলেন 'ধ্বংস'র মতো গল্পের মুখোমুখি। দেশের ভৌগোলিক অর্গল ভেঙে বিশ্বসভ্যতার শুভকামনায় পূর্ণ যে সমাজমন রবীন্দ্রনাথের, তার হদিস কি বিশেষ একদিনের জন্মদিবস কি প্রয়াণদিবস উদ্‌যাপনে মিলবে? এই যে তাঁর প্রয়াণদিবস উপলক্ষে সাধ্যমতো শ্রদ্ধার্ঘ্য সাজিয়েছি আমরা, সে-আয়োজনেও তো আন্তরিকতার সঙ্গে মিশে আছে আধুনিকতা! এমনই তাঁর সৃজনের বৈচিত্র্য আর ব্যাপ্তি যে আমাদের সব বিফলতায় রবীন্দ্রনাথ উপশম, আমাদের সব সফলতায় তিনি উদ্বৃত্ত। বর্তমান মহামারীর প্রকোপে বাসন্তী দেবী মহাবিদ্যালয় যথোচিত মর্যাদায় সাজাতে পারল না, এই প্রতিষ্ঠানের ছয়দশক পূর্তির অনুষ্ঠান। এই না-পারার উপশমও আমরা খুঁজে নিতে চাইছি আজই, রবীন্দ্রপ্রয়াণদিবস পালনের আশ্রয়ে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পথ চলাকে ফিরে দেখা, প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন প্রয়াত বা বিগতদের মনে করা— এই সব প্রয়াসেই রবীন্দ্রসৃজনের দুয়ারে কোনো-না-কোনোভাবে দাঁড়াতেই হতো আমাদের। আধুনিক চিন্তাভাবনা, রীতিনীতির সব বালাই মেনে এ-মহাবিদ্যালয় যদি পঁচাত্তরে পৌঁছয়, সেই অনাগত উদ্‌যাপনও রবীন্দ্ররিক্ত হবে না। রবীন্দ্রস্মরণ আমাদের সব অনুষ্ঠানেরই অব্যর্থ উপমা।

কিন্তু সেই স্মরণকে কি একদিন থেকে প্রতিদিনে স্বতঃস্ফূর্ত বিছিয়ে দিতে পারি আমরা? আজ দুনিয়া জুড়ে কালো হাওয়া বইছে, বিপর্যয়ের কথা সকলের মুখে মুখে; স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, অর্থনীতি থেকে সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতাপ থেকে সে রাষ্ট্রের বিরোধিতা—সবই বিষমতায় জর্জর, আধুনিকের বর্বরতায়, সভ্যতার নির্লজ্জ আস্ফালনে আলুথালু। এই প্রাত্যহিকে কি মনে করি রবীন্দ্রনাথের *কালান্তর* গ্রন্থটির 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধের সেই অসামান্য অংশ?

> ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করতে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।[৬]

স্বাধীন দেশের ভয়ানক অগ্রগমনে নিহিত পরতন্ত্রতার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি। কিন্তু উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁর দেশবাসীর অনাগত ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে ওই মর্মান্তিক সত্যি। 'সত্যের আহ্বান' তো না-হয় প্রবন্ধের কথা, রবীন্দ্রসৃজনে *রাজা-অরূপরতন-শাপমোচন*-এর পরিক্রমা পাঠকের, দর্শকের অনেক বেশি চেনা। *রাজা* (১৩১৬ব.)-কে সংস্কার করে একদশক বাদে *অরূপরতন* (১৩২৬ব.)-এ পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২-এ *অরূপরতন*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ তার প্রথম সংস্করণের থেকে কিছু বদলাল, কিন্তু বাদ পড়ল না সেই নেহাতই

সাধারণ পথচারী, সুবর্ণকে আসল রাজা বলতে মানতে পারেনি বলে, যার হেনস্থা হয়েছিল প্রচুর। কুম্ভ নামের সেই পথচারীর সংলাপ অপরিবর্তিত আছে *রাজা* থেকে *অরূপরতন*-এ:

> ...সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র'স্পর্শ ছাড়া কিছুই তো বাধত না।...যেবার মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।[৭]

'আমরা সবাই রাজা'র সেই দেশে সুবর্ণও আসলে নকল! রবীন্দ্রনাথ কি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ হয়রানি। উপনিবেশ থেকে স্বাধীন দেশে, আজ এই বিশ্বায়নের আবর্তেও তাঁর দেশের মানুষে তো ফিরে ফিরে নকল রাজাকে আসল ভেবে ঘুরে মরছে— একবার নয়, বারবার। 'সবাই রাজা'র দেশ অধরা থেকে গেছে, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালে শেষপর্যন্ত ঠাকুরদা, সুরঙ্গমা, পথচারী কুম্ভ, সকলকে বাদ দিয়ে পৌঁছেছিলেন অরুণেশ্বর-কমলিকার *শাপমোচন*-এ।

এসব কথা একদিনের উদ্‌যাপনে খুব মানানসই নয়। কিন্তু উদ্‌যাপনের অছিলায় যেন ভুলে না যাই, এই একুশ শতকেও নিত্যকার মানবিক যাপনে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য। সংকটকে সংকট বলে, অন্যায্যকে অন্যায্য বলে শনাক্ত করতে আমাদের প্রাত্যহিকে আজ নানারকম ভয়, সংশয়, লাভ-ক্ষতির উৎকট সব হিসেবনিকেশ। ওই হিসেবের কদর্যতাকে, সংশয়ের ভীরুতাকে প্রত্যাখ্যান করতে যে সমাজমনের বিকাশ জরুরি, তার প্রস্তুতিতে লাগে রবীন্দ্রনাথের মন-মনন-সৃজনের কাছে প্রতিনিয়ত সমর্পণ। পরাধীন দেশে আন্দোলনের যে-চলনকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে দেশহিতের প্রতিকূল, সে-চলনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, চিঠিতে। কোনো ব্যক্তিক লাভ-ক্ষতির জয়-পরাজয়ের হিসেব সেখানে বড় হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখী শিক্ষা কি সত্যিই জীবনের দিকে ফেরাতে পেরেছে তাঁর দেশবাসীর মুখ? নাকি সে-শিক্ষার প্রয়োগ ঘটে গেছে পলায়নের পথ কাটতে?

উদ্‌যাপনের আড়ম্বরে হারিয়ে যাচ্ছে যাপনের রবীন্দ্রসংলগ্নতা—এমন বেদনা মূর্ত হয়েছিল রবীন্দ্র-পরবর্তী এক কবির লেখায় ঃ

> তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি?
> হরেক উৎসবে হৈ হৈ
> মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
> তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

আর বাইশে শ্রাবণ?
কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,
বাদলের প্রথম প্লাবন,
সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ?

অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনো আবেদন?[৮]

বিষ্ণু দে-র *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ১৯৫৮-তে, রবীন্দ্রশতবর্ষের তিনবছর আগে। তারপর একশ, একশ পঁচিশ, একশ পঞ্চাশের আড়ম্বরে ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁয়ায় ক্রমেই যেন আড়ালে সরে গেছে রবীন্দ্রনাথে আমাদের অভিনিবেশ। অথচ এই কালো হাওয়ার দুনিয়ায় রবীন্দ্রসৃজনকে আমাদের বড় প্রয়োজন—উপশমের জন্য নয়, পলায়নের জন্য নয়, দুরূহ প্রাত্যহিককে যুঝবার জন্য, কুৎসিত বীভৎসাকে নির্ভয়ে ধিক্কার জানানোর জন্য। অপঠিত নির্মনন থেকে মুক্ত কোনো সটান অথচ নিবিষ্ট আবেদন গড়ে তোলা আদৌ সহজ নয়। বিশেষত বিষয় যেখনে রবীন্দ্রসৃজনের তুল্য মহাসমুদ্র। তাই একদিনের রবীন্দ্র-উদ্‌যাপন থেকে প্রতিদিনের রবীন্দ্রযাপনে পৌঁছনোর পথও দুরূহ। সে কঠিন, সে দুরূহ যদি নাগালে না-ও আসে, তবু অভ্যাসের অচলায়তন ভেঙে দুরূহকে দুরূহের স্বীকৃতিটুকু যেন দিতে পারি; এই হোক আজকের উদ্‌যাপনে আমাদের বিনীত অঙ্গীকার।

২২শে শ্রাবণ, ১৪২৭

কম জানা দু-একটি কথা

১৯১০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই রাজসিকতার স্থূলহস্তাবলেপটা নূতন এইজন্যে তার প্রতাপটা অপরিমিত এবং কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে সাহস করে না। পূর্ব্বকালে নবরত্ন সভায় রাজা একজনমাত্র ছিলেন সুতরাং নবরত্নকে আচ্ছন্ন করতে পারতেন না; এখন রাজা এত রকম বেরকম, তাদের সংখ্যায় এত বেশি, তাদের ফরমাস এত বিচিত্র, তাদের মেজাজ এত অনিশ্চিত, তাদের ঔদার্য্যের এত অভাব অথচ দৌরাত্ম্যের এতই প্রাদুর্ভাব যে আসল জিনিসকে আর দেখবার জো থাকে না।[৯]

ওই 'রকম বেরকম'-এর ভিড়ে আসল রাজাকে অর্জন করা যেন রবীন্দ্রসৃজনের প্রায় এক অন্বিষ্ট। উপরের চিঠিটির একশতক পেরিয়ে গেছে, যখন রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষে যে রবীন্দ্রনাটক বাংলা গ্রুপথিয়েটারের অলিন্দে সবচেয়ে বেশি চর্চিত হয়েছিল, তার নাম *ডাকঘর*। *কসবা অর্ঘ্য-র Juouney to ডাকঘর, রেনেসাঁস* প্রযোজিত *রাজার চিঠি, বিডন স্ট্রিট* শুভম-এর *ডাকঘর আছে অমল নেই, বহুরূপী-র রাজার খোঁজে,* প্রতিটিই *ডাকঘর*-অনুপ্রাণিত প্রযোজনা। তাদের অনেকেরই বিন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছিল ১৯৪২-এ পোল্যান্ডের ওয়ারশ-তে নাৎসি দমন-শাসনের জমানায় ডাক্তার করজ্যাক-এর অনাথ আশ্রম প্রযোজিত *The Post Office*। রাজার চিঠি এসে গেছে, ছেড়ে দিতে হবে আশ্রমবাড়িটি। এমন সংকট-মুহূর্তে *ডাকঘর* অভিনয়ের থেকে মহত্তর কিছু

ভাবতে পারেননি করজ্যাক, তাঁর প্রযত্নে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের কাছে জীবন-মরণের পূর্ণতম অর্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর ওই অভিনয় শেষ হতে-না-হতেই রাজার চিঠির জোরে *The Post Office*-এর ওই শিল্পীদের ঢুকতে হয়েছিল গ্যাস চেম্বারে। এমন মর্মান্তিকও তবে হতে পারে রাজার চিঠির ইঙ্গিত![১০]

কেন যে *ডাকঘর* আর বিশেষত *ডাকঘর*-এর ওই ওয়ারশ প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের ১৫০ বছরে এত গুরুত্ব পেয়েছিল বাংলার নাট্যকর্মীদের কাছে, তার একরকম কারণ বানিয়ে তোলা যায় ২০০৮-এ বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত অঙ্কুর রায়চৌধুরীর *ডাকঘর পড়ছি*[১১] বইটির ছত্রে ছত্রে। যে-স্কুলে অঙ্কুর তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে *ডাকঘর* পড়েছিলেন, তার নাম *শিক্ষামিত্র*, ঠিকানা দক্ষিণ কলকাতার বেহালা। অঙ্কুরের কথায় 'ছোটলোকদের স্কুল'; বাড়ি-বাড়ি গতর খাটা মায়েদের আর বেকার-আধাবেকার বাবাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়তে আসে। তারা যখন পাঠ্যপুস্তকের বদলে *ডাকঘর* নাগালে পেল, নিজের-নিজের মতো করে তারা রাজা আর তার ডাকঘরের অর্থ বানাল। রাজার চিঠির জন্য অমলের আকুলতা ব্যাখ্যা করল। অঙ্কুরের লেখায় সে-সব মর্মান্তিক অর্থবোধের হদিস পেয়ে পাঠকের চমকে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তেমন তো কই ঘটল না! *ডাকঘর পড়ছি* বইটি হারিয়ে গেল পাঠকের মনোযোগের পরিসর থেকে। কেন এমন হলো, তার কারণ খুঁজেত আরও একবছর পিছিয়ে যেতে পারি। ২০০৭-এ বেরিয়েছিল একটি প্রবন্ধসংকলন—*কেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই এবং কীভাবে*। লেখক সৌরীন ভট্টাচার্য গোড়াতেই বলেছেন :

> ...আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা এখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোকাবিলা করে উঠতে পারিনি...এত রবীন্দ্র উৎসব, এত নৃত্যগীত, এত রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একক ও সম্মেলক অনুষ্ঠান, এত রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়, তবুও...মোকাবিলা করতে পারিনি? তাহলে মোকাবিলা বলতে কী বুঝি...(?)...সংস্কৃতিতে মোকাবিলার প্রশ্ন...অনেকটাই প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্ন। আমার প্রয়োজনের দিনে, আমার একান্ত আপদে আমি যাঁর কথা ভাবতে পারি, তিনি যদি ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে যে সংযোগ তৈরি হয় তার ধরন তো আলাদা হবেই। আমি ভাবি বা না-ভাবি তেমন সংকটের দিনে যিনি পাশে দাঁড়াতে পারেন, তাঁর জন্য আমার যে প্রয়োজন তা অন্য রকম হবে বই কি। 'রাজা' নাটকের সেই ভয়ানক আগুনের দৃশ্য...রানীর অত বড়ো সর্বনাশের দিনে নেপথ্যে রাজার গলায় শোনা গিয়েছিল বরাভয়, 'ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না'। এমন ভরসার কথা কজন শোনাতে পারে। রানীর সেদিন খুব প্রয়োজন ছিল, সংকটের আর্তি ছিল, এবং তা যতদিন না ততদিন হিসেব মেলেনি, মোকাবিলা হয়নি রাজার সঙ্গে। মোকাবিলার জন্য তাহলে প্রয়োজন দরকার। সেই প্রয়োজনের তাগিদে বেরোলে এসব প্রতিমায় হয়তো শুধুই আধ্যাত্মিকতা খুঁজে ফিরব না আমরা।[১২]

এইভাবে আমাদের পাঠের অভ্যাসকে ভাঙতে ভাঙতে বইটি এগোয়। রবীন্দ্রসৃজনের কত চেনা মুহূর্ত থেকে কত অচেনা প্রাপ্তির জমি দৃশ্যমান হয়। তবে নিজেদের যথার্থ প্রয়োজনকে শনাক্ত করতে আলস্য আর আত্মরতির অন্ত নেই আমাদের। তাই *শিক্ষামিত্র*-র খড়কুটো ছেলেমেয়েদের কাছে *ডাকঘর*-এর অর্থবোধ

শিখব, এমন প্রয়োজন আমাদের চৈতন্যে আসে না। আবার নাৎসি-রাজের বিরুদ্ধে *ডাকঘর*-এর মর্মভেদী স্বরূপ নিয়ে সে-ই আমরাই কথা বলি! তাই *ডাকঘর পড়ছি*-র মতো বই হারিয়ে যায়। *কেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই এবং কীভাবে*-র মতো বই রবীন্দ্র-অনুরাগীদের আধ্যাত্মিকতা-অন্বেষণের ফেরে একটেরে পড়ে থাকে।

বছর পেরিয়ে গেল, অতিমারীর প্রকোপে বিশ্ববাসী নাজেহাল। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপরে নিদারুণভাবে নির্ভরশীল ভারতের অর্থনীতি কেমন করে বাঁচবে? যে-সংকটের প্রহর গুনছি আমরা, তা কতটা অজানা জীবাণুর (ভাইরাস) দৌরাত্ম্য আর কতখানিই বা রাজনীতির বা অর্থনীতির কিংবা উভয়ের যৌথ উদ্যোগে বানানো কোনো খেলা, 'রকম বেরকম'-এর রাজার ক্ষমতার খেলা, তা ভাবতে অসহায় লাগে। এই সংকটেও কি প্রয়োজন রবীন্দ্রভাবনার কাছে, রবীন্দ্রসৃজনের কাছে সমর্পণের? যে-প্রয়োজনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে চাওয়া, আমাদের অক্ষমতার স্বীকৃতি বিছিয়ে সেই প্রয়োজনের সঙ্গে মোকাবিলা?

২৫শে বৈশাখ, ১৪২৮

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধ্বংস', *গল্পসল্প, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮ ব., পৃ-৫০৬

২. ওই. পৃ-৫০৭

৩. ওই. পৃ-৫০৮

৪. ওই

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রাগুক্ত সংস্করণ), ওই, পৃ-৭৪১-৪৫

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সত্যের আহ্বান', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রাগুক্ত সংস্করণ), দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৭ ব., পৃ-৫৮৭

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রাগুক্ত সংস্করণ), পঞ্চম খণ্ড, পৌষ ১৩৯৪ ব. পৃ-২৮১; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অরূপরতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রাগুক্ত সংস্করণ), সপ্তম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৯৫ ব., পৃ-২৭৫

৮. বিষ্ণু দে, 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, কবিতাসমগ্র* ২, আনন্দ, বৈশাখ ১৩৯৭ ব., পৃ-১৬৩

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা ২৪ নং চিঠি', *চিঠিপত্র* পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪০২ ব., পৃ-৬০

১০. রুশতী সেন, 'কোথায় পাব তারে', *এলোমেলো পাঠে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য*, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ-৭০-৭৯

১১. অঙ্কুর রায়চৌধুরী, *ডাকঘর পড়ছি*, বিশ্বভারতী, ১৪১৫ ব.

১২. সৌরীন ভট্টাচার্য, 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই এবং কীভাবে', *কেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই এবং কীভাবে*, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ-১৩-১৪

বাসন্তী দেবী মহাবিদ্যালয়ের দুটি আন্তর্জালিক অনুষ্ঠানে ২৫ শে বৈশাখ এবং ২২ শে শ্রাবণ পঠিত দুটি কথিকার সামান্য পরিমার্জিত সংস্করণকে একত্র করে গোটা লেখাটির জন্য একটি মূল শিরোনাম বাছা হলো।